দূরের মাটি, কাছের কণ্ঠস্বর

বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার সাহিত্য চর্চা

সম্পাদনা
রজতশুভ্র মজুমদার

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

"খুব ভোরে আমি ইউফ্রেটিসে স্নান করেছি,
আমি কঙ্গোর কাছে ঘর তুলেছিলাম আর সে আমায়
ঘুম পাড়িয়ে দিল।
আমি নীল নদের দিকে তাকালাম আর তার ওপর গড়ে
উঠলো পিরামিড।
যখন এব্ লিংকন নিউ অর্লিন্স গিয়েছিলেন তখন
মিসিসিপির গান শুনেছি আমি, আর
দেখেছি তার কাদামাখা বুক সূর্যাস্তে সোনালি
হয়ে উঠছে।

আমি নদীদের চিনেছি :
প্রাচীন আর ধূসর নদীদের।

ওই নদীদের মতো গভীর পর্যন্ত
গজিয়েছে আমার প্রাণ। ..."

[ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২-১৯৬৭)-এর
'নদীদের কথা বলে এক নিগ্রো' কবিতার কিয়দংশ
অনুবাদ : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়]

হ্যাঁ, 'ওই নদীদের মতো গভীর পর্যন্ত গজিয়েছে' সাহিত্যের প্রাণ। কোনো দেশের গণ্ডিতে তাকে আবদ্ধ রাখা যায় না। প্রখ্যাত রাশিয়ান কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি কবিতার

ক্ষেত্রে যে কথা বলেছেন— 'Poetry knows no borders; it has no capitals and no provinces. Languages are many but poetry is one'.—বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে তা সমগ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। তা ছাড়া পৃথিবী ছোটো হয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। কবিকে উদ্ধৃত করে যদি বলি 'পৃথিবী একটি গ্রামের নাম' আজ আর বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'The Vintage Book of Contemporary World Poetry' নামক ৬৫৪ পাতার কাব্যসংকলনের মুখবন্ধের শুরুতেই সম্পাদক J.D.Mc Clatchy-র মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি—

"In Emerson's eeire definition, the world is everything that is not my self, including my own body. For most of us nowadays, the world is altogether less foreign, less alienated, less extremely other. And less dizzyingly enormous. Technology, once having created the global village, has since domesticated it nearly intervalized it. From wherever elsewhere is, first came the explorer's account, then a map, next a postcard, now a documentary ! everything seems closer. The most distant locale, the most exotic customs are now the size of a screen, and the term "remote control" is less a device than a metaphor."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো কিছুই আজ আর দূরের নয়। আবিশ্ব মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আতঙ্ক-সন্ত্রাস, মহত্ত্ব-সংকীর্ণতা, বিষাদ-রিরংসা, সাহস-দুঃসাহস, অভিমান-বঞ্চনা, চাওয়া-পাওয়া, চেয়ে-না-পাওয়া কিংবা না-চেয়ে পাওয়ার অভিব্যক্তিও একই রকম। শুধু ভিন্নতার সৃষ্টি করে ভাষা। আর এখানেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে অনুবাদ। অনুবাদের সীমাবদ্ধতা অনেক; তা সত্ত্বেও তাকে মেনে নিতে হয়, কারণ মানুষ ভাষার সত্তার মধ্যেই আবদ্ধ। মনে পড়ছে হাইডেগার-এর সেই বিখ্যাত উক্তি —

"মানুষ ভাষার প্রতি দায়বদ্ধ এবং ভাষার সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে সে পা ফেলতে পারে না এবং অন্য কোনও স্থান থেকে ভাষাকে সে দেখতেও পারে না। তাই আমরা ভাষার চরিত্র ততটুকুই দেখতে পাই; যতটুকু ভাষা আমাদেরকে তার অধিকারভুক্ত করেছে।"

এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তো অনুবাদেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পান, জাপানের কোয়াসিমোদো কিংবা তুর্কির পামুক। কনস্ট্যান্স গারনেট ছাড়া কি দস্তয়েভস্কির কথা ভাবা যায়? কিংবা আমাদের লোকনাথ ভট্টাচার্য না থাকলে আর্তুর র‍্যাঁবো কী করে বাঙালি পাঠকের মনে জায়গা করে নিতেন? পূর্ব ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র কীভাবে তৈরি হত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া? অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ছাড়া কি জার্মানসাহিত্য আমাদের কাছে এতখানি উন্মোচিত হতে পারত? কিংবা চিন্ময় গুহ ছাড়া ফরাসি সাহিত্য বা তরুণ ঘটক ছাড়া স্প্যানিশ সাহিত্য কল্পনা করা যায়?

॥ ২ ॥

বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্ব যে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলি। আমাদের পবিত্র কর্তব্য এ ভাষার ক্রমোন্নতি ও প্রসার। তাই অন্যান্য বিদেশি ভাষার সঙ্গে বাংলা কীভাবে সম্পর্কিত জানার প্রয়োজন অপরিসীম। উদাহরণ স্বরূপ, নোবেলজয়ী জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাসের রচনায় কী ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে বাঙালি জীবন ও রাজনীতি! মূল জার্মান থেকে সুনন্দা বসু ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদে গ্রাসের ছোট্ট একটি কবিতা 'শো ইওর টাং' থেকে পুরোটাই এখানে তুলে দিচ্ছি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য—

"আজ তিনি উড়ে এলেন
হন্তারক নিহত বিধবার পুত্র
সঙ্গে এনেছেন তাঁর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা
দেখাচ্ছেন অকাতরে—
দেখো, জলমগ্ন গ্রাম, ধানখেত, শহরতলি?
বস্তি? ছ'লক্ষ মানুষের ত্রাণ শিবির
মাথা গোঁজার স্থান নেই।
তবু তারা ভোটার
কিন্তু যখন সাগরপুত্র ধরায় নামলেন
সাদা ধুতি পরিহিত বৃদ্ধ কঠিন বসু ... যাকে
ইন্দিরার মাথা ভাঁঙা গুন্ডারাও শেষ করতে পারেনি
না হেসে বললেন, কেরোসিন চাই
ব্রাহ্মণের মতোই শিক্ষিত বসু
এক্ষেত্রে মার্কস থেকে কোনও সাহায্যই পাননি
কারণ দাস ক্যাপিটালের কোনও অংশেই
সেই বন্যার কথা লেখা নেই
যে বন্যা ঠিক ধর্মীয় উৎসবের আগেই হানা দেয়।"

১৯৮৬-র বন্যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের ঘৃণ্য রাজনীতির যে শাণিত বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন এই কবিতায়, তা আমরা জানব না শুধু ভাষার প্রতিবন্ধকতার জন্য? বন্যা আসে। বন্যা যায়। মহানগরী মেতে ওঠে পুজোর বিলাসে। ভণ্ড রাজনীতিকদের মিথ্যে অঙ্গীকারের ফাঁসে পড়ে অসহায় মানুষেরা ডুবে যায় অতলান্ত অন্ধকারের গহ্বরে। মানবতার এই দুঃসহ অবক্ষয় বামপন্থী গ্রাস কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি এদেশে এসে।

শুধু কি রাজনীতি, বাঙালির রুচি ও সংস্কৃতির পরতে পরতে জড়িয়ে পড়েছিল তাঁর লেখা! কলকাতাকে ভালোবাসেন বলেই লেখকের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য কল

অব দ্য টোড'-এ অন্যতম প্রধান চরিত্র একজন বাঙালি যুবক—সুভাষচন্দ্র চ্যাটার্জি। ইউরোপের সাম্প্রতিকতম সাহিত্য গ্রাসের হাত ধরেই এই প্রথম কোনও বাঙালিকে এতখানি গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিয়েছে। সুভাষ পোল্যান্ডের বন্দর শহর ডানজিগ-এ সাইকেল রিকশা তৈরি ও চালানোর ব্যবসা করে।

তৃতীয় বিশ্বের চোখের জল আর ভালোবাসা মাখা এই রিকশাগুলি সুখী স্বার্থপর প্রযুক্তি সর্বস্ব পশ্চিমি রাস্তায় উত্তর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে এক নিরুচ্চার জেহাদ। মাদ্রিদ, রোম থেকে শুরু করে সমস্ত পশ্চিমি মেট্রোপলিসে সুভাষের দুর্জয় সাফল্য আসলে ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাচ্যের দিগ্‌বিজয়। গ্রাসের ভাষায়, "Rome has no fumes no constant honking only the melodious sound of the three bells, Friend chatterjee has won and we with him." উপন্যাসের শেষেও অর্থসর্বস্ব পাশ্চাত্য লোলুপতার বিরুদ্ধে মুক্ত পোলিশ-বাঙালি চেতনার বিজয় নিশান উত্তোলিত হয়েছে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ witty surrealistic idiom-এ :

"It announces the predestined Asian future of Europe, free from nationalistic narrowness, no longer hemmed in by language boundaries polyphonically religious super slowed down, softened by the new warm and wet climate."

অথচ কী বিনয়াবনত কণ্ঠে তিনি বলতে পারেন—

"কলকাতা এমনই একটি শহর, যে শহর একেবারে তার নিজের জেমস জয়েস দাবি করে। বাঙালি জেমস জয়েস বা আলফ্রেড ডবলিন বা ডস পাসোস। একমাত্র যার জন্ম এখানে, যার শিরায় এ শহরের রক্ত প্রবাহিত, কেবল এই লেখকই কলকাতাকে নিয়ে 'ইউলিসিস' বা 'আলেকজান্ডারপ্লাৎস' বা 'ম্যানহাটান ট্রান্সফার'-এর মতো উপন্যাস লিখতে সক্ষম। একজন বিদেশি গবেষণা করতে পারে, কিন্তু সে লেখা কখনওই ভেতর থেকে উঠে আসা মহাকাব্য হবে না।"

॥ ৩ ॥

মহাকাব্য না হোক, বিশ্বসাহিত্যকে জানতে হবে না? একই পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়ার নৈতিক দায়বদ্ধতা কীভাবে এড়াব আমরা? এই যে ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু-র পতনের পর ফ্রান্স চলে গেল ভিয়েতনাম থেকে, জুটল এসে আমেরিকা, দেশনেতা হো চি মিন অপ্রতিরোধ্য—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী, ফলত ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ভিয়েতনামে যার নাম স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিসংগ্রাম — এ সবই তো আমরা ইতিহাস থেকে জানি। কিন্তু এই যুদ্ধের বীভৎসতা ও বিষণ্ণতার দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া কতখানি প্রভাব ফেলেছে সেখানকার সাহিত্যে, যুদ্ধের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে বইতে হয়েছে ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষকে — আমাদের দূরবর্তী আত্মীয় যারা—এসব আমরা জানব না? আমরা শরিক হব না তাদের ব্যথা-বেদনা-অপ্রাপ্তির? মধ্য-দক্ষিণ

ভিয়েতনামের কোয়াং বিন প্রদেশে, যেখানে চলেছে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সেখানে লা থুই জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম বিখ্যাত কবি লাম থি মাই জা-র। যুদ্ধের আগুনে ঝলসানো মাই জা-র কবিতা। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি ছোটো কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি—

বোমা ক্রেটার আকাশ

"লোকে বলে, গ্রামে তুমি ছিলে রাস্তা বানানোর মজুর
আমাদের দেশ এতটাই ভালোবেসেছিলে
যে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আকাশে আলো দেখালে তুমি
তারপর মার্কিন বোমা পড়ে তোমার গায়ে, হায়
এবং সেনাদের যাওয়া আসার পথটি অক্ষত থেকে যায়

আমাদের ইউনিট যখন সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় গেল
বোমার খোঁদল দেখে তোমার কথা মনে পড়ে
তোমার সমাধি দ্যুতিময় পাথরে দীপ্যমান
তোমায় ভালোবেসে রাশি রাশি পাথর, লক্ষ্মী মেয়ে

তোমার মৃত্যু-বোমার গর্তে তাকিয়ে দেখি
তাতে জমা বৃষ্টির জলে একফালি নীল আকাশ
দয়ালু আমাদের মাতৃভূমি
আকাশের জলধারা মোছে ধরার বেদনা

মাটির অনেক নীচে শুয়ে আছ তুমি
আকাশ সাগ্রহে ঝুঁকে রয়েছে তোমার গহ্বরে
তোমার আত্মা রাতে পথ দেখায়
জ্বলজ্বলে ধ্রুবতারার মতন
তোমার নরম ফরসা ত্বক কি করে
আকাশের সাদা মেঘ হয়ে যায়?

সূর্যালোকিত আকাশের নীচে হাঁটি
তোমার নিজস্ব আকাশ
আর ওই জলজ্যান্ত চিন্তিত গোলক—
সূর্য, নাকি তোমার হৃদয়
আমাকে আলো দেখায়
যখন আমি একা দীর্ঘ পথ হাঁটি?

পথের নামই আসলে তোমার নাম
তোমার মৃত্যু এক বালিকার নাম লেখা নীল আকাশ
তোমার জীবন আলোকিত করে আমার আত্মাকে

আর আমার বান্ধবীরা যারা তোমায় দেখেনি কখনও—
প্রত্যেকের মনে তোমার মুখের আলাদা আলাদা প্রতিচ্ছবি"

[**অনুবাদ** : অংকুর সাহা]

এটি ভিয়েতনামের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা। যে বাচ্চা মেয়েটির কথা এখানে বলা হয়েছে, সে আসলে রাস্তা তৈরির কামিন। রাতের আকাশে বোমারু বিমানের শব্দ শুনে লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল সে। আলো দেখে তার গায়ে বোমা ফ্যালে মার্কিন বিমান। অনেকদিন ধরে তার মৃত্যুস্থানটি দেখতে আসত মানুষ এবং পাঠ করত এই কবিতাটি। এখানে আমার প্রশ্ন, এই অতি সাধারণ বালিকাটির কথা ইতিহাস কি লিখে রাখে? সাহিত্য রাখে। সাহিত্য-ই আমাদের ছোটো ছোটো মানুষের ছোটো ছোটো স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস রচে যায় অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্নতায়। সেই ইতিহাস পাঠের জন্য অনুবাদ অনস্বীকার্য।

ফ্রান্সে ভিয়েতনামি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু হয় সেই ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় আমেরিকায়। ১৯৭৯ সালে 'The Heritage of Vietnamese Poetry' প্রকাশিত হয় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর ১৯৯৬-এ ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশিত হয়েছে 'An Anthology of Vietnamese Poems'। এ ছাড়া জন ব্যালাবানের অনন্যসাধারণ অনুবাদ গ্রন্থ 'Spring Essence – The Poetry of Ho Xuan Huong' প্রকাশিত হয়েছে এরও পরে। নয়-এর দশকের শেষদিকে মার্থা কলিনস্ এবং তো দিউ লিন-এর যৌথ উদ্যোগে লাম থি মাই জা-র কবিতার ইংরেজি অনুবাদকর্ম শুরু হয়। ভিয়েতনামি কবিতা যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নত আধুনিক কবিতার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে, এইভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ আমরা কত পিছিয়ে আছি! ভিয়েতনামি সাহিত্য নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হল না, যদিও কিছু বিচ্ছিন্ন কাজ প্রশংসার দাবি রাখে।

॥ ৪ ॥

ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর স্থানিক সংস্কৃতিতে জানতেও তো অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নাইজিরিয়ার প্রখ্যাত কবি ও কথাশিল্পী অ্যালবার্ট চিনুয়ালুমোগু আচেবে (যিনি চিনুয়া আচেবে নামে খ্যাতিলাভ করেন) যাঁর তিনখানি সুবৃহৎ উপন্যাস নিয়ে এক অনবদ্য আফ্রিকান ট্রিলজি — নাইজিরিয়ার উমুয়োফিয়া গ্রামের এক পরিবারের

তিন প্রজন্মের কাহিনি—লক্ষ লক্ষ কপি অনূদিত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায়, তাঁর একখানি কবিতার কিয়দংশ অংকুর সাহার সনিষ্ঠ অনুবাদে এরকম—

ওকিগ্‌বোর জন্যে শোকগাথা
"আমরা কাকে খুঁজে বেড়াই?
আমরা কাকে খুঁজে বেড়াই?
ওকিগ্‌বোকে খুঁজে বেড়াই।
নোজোমালিজো।
সে গেছে কাঠ কাটতে, ফিরে আসতে দাও।
সে গেছে জল আনতে, ফিরে আসতে দাও।
সে গেছে দূরের হাটে, ফিরে আসতে দাও।
ওকিগ্‌বোকে খুঁজে বেড়াই।
নোজোমালিজো!
আমরা কাকে খুঁজে বেড়াই?
আমরা কাকে খুঁজে বেড়াই?
ওকিগ্‌বোকে খুঁজে বেড়াই!
নোজোমালিজো!
সে গেছে কাঠ কাটতে, উগ্‌বোকো তাকে টেনে নিয়ো না।
সে গেছে নদীর পারে, আইই তাকে গিলে ফেলো না।
সে গেছে দূরের হাটে, বাজারের কালবোশেখি তাকে
কাছে টেনো না।
সে গেছে লড়াই করতে ওগ্‌বোনুকে তার
পথ ছেড়ে দাও।
ওকিগ্‌বোকে খুঁজে বেড়াই।
নোজোমালিজো! ..."

ইগ্‌বো ভাষায় লেখা এই কবিতাটি কবি ক্রিস্টোফার ওকিগ্‌বোর স্মৃতির উদ্দেশে। ইগ্‌বোদের দেশে কম বয়সে মানুষের মৃত্যু হলে তার আত্মীয়রা খেলার ছলে তাকে সারা দেশ খুঁজে বেড়ায়; চিৎকার করে বলে, কী ছেলেমানুষ, লুকোচুরি খেলছে আমাদের সঙ্গে! 'নোজোমালিজো' শব্দের অর্থ লুকোচুরি খেলা, এই ইগ্‌বো শব্দটি অংকুর সাহার অনুবাদে অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে ধ্বনিমনোহারিত্ব ও শব্দময়তার অনুরণনের প্রয়োজনে। এখানে উল্লেখ্য, কবি ওকিগ্‌বো মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মারা যান।

এই যে একটি জনগোষ্ঠীর স্থানিক সংস্কৃতি এত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে, অনুবাদ ছাড়া আমরা তার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারি না। শুধু কি স্থানিক সংস্কৃতিকে জানা, ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর একান্ত স্থানিক প্রবাদ, প্রহেলিকা, লোককথা

আশ্চর্যভাবে পৌঁছে যায় এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। এইভাবেই অনুবাদের মাধ্যমে মেলবন্ধনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। 'ভারতজোড়া গল্পকথা'র অবতরণিকা 'ভারতবর্ষের সন্ধানে' নিবন্ধে ঠিক এ-কথাই সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে সংকলনের সম্পাদক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কলমে। তার কিছু অংশ এরকম—

"...ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক-ভূতাত্ত্বিক নানা গবেষণা হয়েছে এই দেশকে আবিষ্কারের চেষ্টায়। রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক-প্রশাসনিক-বিচার বিভাগীয় নানা উদ্যোগও রয়েছে। এর পাশাপাশি সাহিত্যেরও একটা ভারত-ভাবনা ছিল, হয়তো তা থেকেই আমাদের একটি মহাকাব্য নাম পেল 'মহাভারত'। রামায়ণেরও ভৌগোলিক বিস্তার কম নয়, রামসীতার পদচিহ্ন প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই মেলে। সতীদেহের যে একান্ন খণ্ড তাও ছড়িয়ে আছে প্রায় সমগ্র দেশে এবং তা থেকে তৈরি হয়েছে নানা সতীকথা সতীগাথা। এমনকি ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর যে প্রবাদ, প্রহেলিকা, লোককথা—যা একান্তভাবে স্থানিক—তাও কীভাবে যেন অন্য জনপদে পৌঁছে যায়। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের লোককাহিনির সাপ প্রায় একইরকম ভাবে রাজস্থানে দুর্জন দমন করে, বাংলার দুখিনি মায়ের কথা পাঞ্জাবের উপকথায় চোখের জলে সমাপ্তি পায়। হয়তো এসব থেকেই একদিন 'ভারতীয় সাহিত্য'-ভাবনা অঙ্কুরিত হল, তৈরি হল সাহিত্য অকাদেমি-সহ বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় সরকারি-বেসরকারি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। অনুবাদের মাধ্যমে এক ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষার পাঠক-লেখকদের কাছে পৌঁছে দেবার এক বৃহত্তর প্রচেষ্টা দেখা গেল। তা থেকে শুধু যে আমাদের নন্দন-অভিজ্ঞতা বিস্তার পেল এমন নয়, আমরা এই দেশকেও অন্যভাবে চিনতে ও জানতে শুরু করলাম। ..."

॥ ৫ ॥

শুধু দেশকে চিনতে বা জানতেই নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিক বা সাহিত্য পিপাসু মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করতেও অনুবাদ অপরিহার্য। এই যে আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনের সময় দশই ফেব্রুয়ারি ২০০৩ স্যাম হ্যামিলের নেতৃত্বে জন্ম নিল PAW, যার পুরো নাম পোয়েটস এগেন্সট ওয়ার— কোনো বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বড়ো সম্মিলিত প্রতিবাদ পৃথিবী আগে কখনও দ্যাখেনি—এত দ্রুত তা কীভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল? পোয়েটস এগেন্সট ওয়ার-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর কবিরা যেন কোনো এক অদৃশ্য সুতোর মালায় জড়িয়ে গেলেন—সমগ্র পৃথিবী থেকে হাজারে হাজারে যুদ্ধ বিরোধী কবিতা আসে PAW-র ওয়েবসাইটে। এইভাবে জনচেতনা তৈরি হয়—যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। প্রায় ওই সময়েই যুদ্ধের বিরোধিতা করে ফার্স্ট লেডি লরা বুশের আমন্ত্রণে রাজধানী ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল বুক ফেস্টিভ্যালে যোগদান ও হোয়াইট হাউসে খাবারের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন প্রথিতযশা আমেরিকান কবি শ্যারন ওল্ডস্ (জন্ম ১৯৪২, সানফ্রান্সিস্কো)। খবরের কাগজে ওই প্রত্যাখানের যে

চিঠি কবি প্রকাশ করেছিলেন তা সমগ্র আমেরিকায় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। ওই চিঠির কিছু অংশের বাংলা ভাষান্তর (গৌতম দত্ত কৃত) এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি—

"প্রিয় মিসেস বুশ :

আমি এই চিঠি লিখে আপনাকে জানাতে চাইছি আমার পক্ষে কেন হোয়াইট হাউসে ও বুক ফেস্টিভ্যালে আপনার সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

যদিও আপনার আমন্ত্রণ খুবই লোভনীয়। ফেস্টিভ্যালে ৮৫,০০০ শ্রোতার কাছে কথা বলার প্রস্তাব উত্তেজনাময়! একজন কবির কাছে নতুন পাঠক পাওয়ার বা কবিতা-পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এই সম্ভবনা ব্যক্তিগতভাবেও, আমরা যারা আনন্দ চাই অন্তরের ও বাহিরের, এ এক দুর্লভ সুযোগ।

পাঠকের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা আমার অন্তরের মধ্যে এক বিশেষ জায়গা জুড়ে থাকে। আমেরিকার একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং' বিভাগের অধ্যাপিকা হিসাবে আমার এইরকম সুযোগ কোনও কোনও সময় এসেছে যেখানে আমার ছাত্ররা আমার শিক্ষক হয়ে গিয়েছিল।

যখন আপনি দেখেন শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম একজন পায়ের গোড়ালি দিয়ে বড়ো বড়ো প্লাস্টিকের অক্ষর ঠেলে দিয়ে দিয়ে অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে তার নতুন কবিতার জন্ম দিচ্ছে, ঠিক তখনই আপনি বুঝতে পারেন কবিতার উৎস কোথায় বা মানুষ কেন লেখে! আপনি যখন দেখেন, এইরকম একজন মানুষ যে নিজের মণি নড়িয়ে নড়িয়ে অ, আ, ক, খ দেখিয়ে দেখিয়ে তার কবিতার প্রথম লাইনের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর তৈরি করছে, যে কবিতাটা সে সারা সপ্তাহ ধরে মাথার মধ্যে বুনেছে, বলে বোঝাতে পারব না সেই তখনই আপনার উপলব্ধি হয় কেন মানুষের পক্ষে সততা, আত্মবিশ্বাস, নতুন কিছু তৈরি করার, নিজের কথা বলার, গান গাওয়ার কী প্রয়োজন।

তাই বুক ফেস্টিভ্যালে যোগদান করা আমার কাছে এক সুন্দর প্রস্তাব। আমি ভেবেও ছিলাম যে এই সুযোগে আপনার আমন্ত্রিত হয়ে, আপনার প্রতি সম্মান রেখেও, আমি মানুষকে বলতে পারব যে আমাদের ইরাকে আগ্রাসন ঠিক কাজ হয়নি। বলতে পারব আমার বিশ্বাসের কথা, যে কোনও জাতি বা দেশের অধিকার নেই অন্য দেশ বা সংস্কৃতি অধিকার করার, যাতে শেষমেশ আমাদের সৈনিকেরা ও সেই দেশের অসংখ্য সাধারণ নিরীহ মানুষেরা প্রাণ হারাচ্ছেন, সে আমাদের গণতন্ত্রের থেকে আসেনি বরং উপরে ক্ষমতাসীন কিছু লোকের মিথ্যের উপর ভিত্তি করা ভুল আদেশের জন্য। আমার বলার ইচ্ছে ছিল, আমাদের দেশে এখন একনায়কতন্ত্রের ও মৌলবাদী ধর্মের ছায়া পড়ছে যা আমাদের দেশের স্বাধীনতা, নানা মত ও পথের এক সাথে বেঁচে থাকার বিরোধিতা করে।

আমি ঠিকও করে নিয়েছিলাম যে ফেস্টিভ্যালে আমার যোগদানে আমেরিকা প্রত্যক্ষ করতে পারবে আর এক অন্য আমেরিকার দর্শন, যে মানুষকে ভালোবাসে, দেশকে ভালোবাসে ও এই অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

কিন্তু যে মুহূর্তে আমার মনে হল, আপনার সঙ্গে প্রাতঃভোজনের রুটি একসঙ্গে খেতে হবে, আমি সেটা কোনওমতেই মেনে নিতে পারলাম না। আমি জানি আমি আপনার সঙ্গে এক টেবিলে বসলেই বুশ সরকারের হঠকারিতার সমর্থন করা হবে।

আপনি যে হাত দিয়ে খাবার দেবেন, সেই হাত যুদ্ধবাজ সরকারের হাতের প্রতিনিধি, যে সরকার মানুষদের অন্য দেশের জেলে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করছে। যে সরকারের হাত রক্ত, পুঁজ, আগুন মাখা। যে সরকার আমেরিকান হিসেবে আমার মতন অসংখ্য মানুষের লজ্জার কারণ হয়েছে। ভাবলেই আমার বমি হয়ে আসে, আপনার ধবধবে সাদা টেবিলক্লথ তার উপরে ঝকঝকে ছুরি, আর মোমবাতির আগুন!

শ্রদ্ধা সহ,
শ্যারন ওল্ডস্‌"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় একাধিপত্যের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রনায়কের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কবি সাহিত্যিকদের উচ্চারণে কোনো বিজাতীয় জাতীয় সংকীর্ণতা কাজ করে না। তাঁরা তখন কোনো অঞ্চলের বা কোনো দেশের নন—সমগ্র পৃথিবীর, বিশ্বমানবতার আদর্শে প্রাণিত। সুতরাং তাঁদের সৃজনকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদকে বিশ্বমানবের প্রয়োজনেই আমাদের জানতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে। আর এখানেই অনুবাদ অপরিহার্য। যুদ্ধ কি শুধু দেশের আগ্রাসন? ধর্মীয় আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, সামাজিক আগ্রাসন— ক্ষমতার যে বহুমুখী আগ্রাসন সবগুলিরই চরিত্র এক, শুধু স্থান কাল পাত্রগুলি ভিন্ন। বিশ্বময় সৃজনশীল মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদের ধ্বনিই একমাত্র পারে বিনা রক্তপাতে নিজ নিজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ-প্রিয় মানুষের মুখ ঘুরিয়ে দিতে।

॥ ৬ ॥

প্রকৃত সাহিত্য শুধু দৃশ্যেরই জন্ম দেয় না। শব্দ, স্পর্শ আর গন্ধেরও আবির্ভাব ঘটায়। এক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করার এই অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'সিনেস্থেসিয়া।' এই প্রক্রিয়ায় কখনও দৃশ্য কেটে গিয়ে ঘ্রাণে চলে আসে, ঘ্রাণ থেকে আসে স্পর্শে, কখনও বা শব্দে ...। এইভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্থানান্তর ঘটে। তখন অনুভূতি দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখকে বুঝতে হয়, প্রাকৃতিক পরিবেশকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। দু'খানি ছোটো উদাহরণের মাধ্যমে আমি বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চাই।

এক. "বুনোমধুর গন্ধে আছে স্বাধীনতা
আর ধুলো, একটি সূর্যরশ্মির
মেয়েটির খোলা মুখ—
বেগনি জবার
আর সোনা

যার নিজস্ব গন্ধ নেই কোনো
জোলো
ওই অর্কিডফুল
আর আপেল ভালোবাসার মতো

অথচ আমরা চিরকালই টের পেয়েছি
রক্তের ঘ্রাণে শুধু রক্তই রয়ে গেছে”

দুই. “... নৌকার দু'ধারে আঘাত করছিল ছোটো ছোটো ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে। যতদূর চোখ যায় জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু মৃত পৃথিবী নিঃশব্দে গুনগুন করে যাচ্ছে। সেই সুর কানে শোনা যায় না কিন্তু সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করা যায়। তা মনকে ভরিয়ে তোলে অনুরণনে। জীবনের অনুভূতি যেন শেষ হয়ে এসেছে, অনন্ত শান্তির অনুভূতি আর সব আশা যেন নিঃশেষিত ... চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসে। দূরে অস্পষ্ট, রহস্যময় গাছগুলো নৌকার সাথে সাথে চলেছিল নিঃশব্দে। আর কাছের গাছগুলো মনে হচ্ছে পিছিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো চুলওয়ালা শয়তানের মতো। নৌকা নড়ছে না। নদীর তীরটাই যেন পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

আমার চোখ জোড়া অন্ধকার ফুঁড়ে আটকে আছে স্থির জলে। তারাদের প্রতিবিম্ব জলে। যেন ঘুমিয়ে আছে চোখ খুলে, জলশয্যায়, জলের ছোটো ছোটো ঢেউয়ের দোলনায় দুলতে দুলতে স্বপ্ন দেখছে।

বাতাসে নেই কোনো আলোড়ন। যে রশিটা দিয়ে মাঝিরা নৌকা টানছে তা একবার আলগা হচ্ছে আবার টানটান হয়ে যাচ্ছে আপন ছন্দে।

মাঝিদের সর্দারের হাতের লগির ওপরের ঘন্টিগুলো প্রতি ধাপে টুং টাং বাজে। নৌকার এক প্রান্তে লাল গনগনে এক উনুন, তা কখনো দপ করে জ্বলে উঠছে,আবার পরমুহূর্তে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। একটা ছোটো ছেলে বালতি দিয়ে নৌকার ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে আসা জল বার করে। নৌকাবোঝাই ধান, গুড়, তেঁতুল আর ভগবান জানেন আরও কিসের বস্তা! ....”

উপরোক্ত প্রথম উদ্ধৃতাংশটি প্রখ্যাত রাশিয়ান কবি আনা আখমাতোভা (১৮৮৯-১৯৬৬)-র একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। কবিতার নাম 'বুনোমধু' ভাষান্তর—আর্যনীল মুখোপাধ্যায়। এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতাংশটি অন্ধ্রপ্রদেশের কথাশিল্পী পালগুম্মি পদ্মরাজু (১৯১৫-৮৩)-র 'নৌকাযাত্রা' ছোটোগল্পের প্রথম দিকের অংশবিশেষ। মূল তেলুগু ভাষা থেকে অনুবাদে ঈশানী হাজরা।

এখানে দুটি উদ্ধৃতাংশই 'সিনেস্থেসিয়া'-র সফল দৃষ্টান্ত, বলা বাহুল্য। আমার প্রশ্ন হল, অনুবাদ কি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিতৃপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পেরেছে? অনুবাদ কি পেরেছে আমাদের রক্তের গন্ধ ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ, ঘন্টির টুং টাং কিংবা

জলের গায়ে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রের স্পর্শকে উপভোগ করার ক্ষমতাকে কেড়ে নিতে? আমার মনে পড়ে যাচ্ছে সিমা আর্ট গ্যালারিতে একবার ছবির প্রদর্শনীতে শিল্পী গণেশ পাইনের একটি ছবি দেখে মুগ্ধ কবি প্রদীপচন্দ্র বসুর প্রতিক্রিয়া। কবি লিখেছেন :

> "... ফ্রেমের মধ্যে ছিল একটা বাগান, এক উড়ন্ত প্রজাপতি ও একটি অন্ধ মেয়ে। ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হল, অন্ধ মেয়েটা নিশ্চয়ই রঙিন প্রজাপতিটাকে দেখতে পাচ্ছে না। ও যে বাগানে দাঁড়িয়ে আছে তা কি জানে? কেউ বোধহয় ওর হাত ধরে বাগানে এনে দাঁড় করিয়ে গাছ ফুল এসবের ছবি এঁকে দিয়ে গেছে মনে! নাহলে, ও একা বাগানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? গাছের সবুজ বা ফুলের বাহার ও দেখতে না পাক, শোনা ছবি থেকে হয়তো কল্পনায় বাগানটাকে সাজিয়ে নিয়েছে মনের মতো! জীবন ওর কাছ থেকে মাটির গন্ধ, ফুলের সুরভি ও গাছের পাতার আন্দোলিত হাওয়াকে উপভোগ করার ক্ষমতা তো কেড়ে নেয়নি! এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন ছবিটিতে দেখলাম, নিজের সাজানো বাগানে অন্ধ মেয়েটি নিজেই প্রজাপতি হয়ে উড়ছে। ..."

ওই অন্ধ মেয়েটির মতোই আমরাও বিশ্বসাহিত্যের বাগানে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যেতে পারি। অন্ধত্ব মেয়েটিকে যেমন প্রতিহত করতে পারেনি, অনুবাদের সীমাবদ্ধতাও তেমনি আমাদের অনায়াসসিদ্ধ বিহারে প্রতিবন্ধকতার পটভূমি তৈরি করতে পারে না। তাই

> "...দেখেছি সবুজ পাতা
> অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
> হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে বেলা,
> ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
> চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
> নির্জন মাছের চোখে, পুকুরের পাশে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
> পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ, মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে। ..."

পৃথিবীর যে-কোনো ভাষায় অনূদিত হয়ে যে-কোনো পাঠকের হৃদয়-সংবিত্তিকে রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে আন্দোলিত করতে পারে সমান ভাবে, প্রমাণ করতে পারে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই বিখ্যাত উক্তির যথার্থতা—

> 'অন্তরের গহন গোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নীচে। আমাদের জীবনে জীবনানন্দ সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।'

অনুবাদের সীমাবদ্ধতা সমুদ্র কিংবা মহাকাশের ভাষাকে কখনও দুর্বোধ্য বা দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারে না। পারে কি?

বাংলাভাষার সঙ্গে অন্য বিদেশি ভাষার যোগাযোগ বা সহযোগিতার কাঙ্ক্ষিত রূপটি পরিমাণে উল্লেখনীয় না-হলেও, আনন্দ হয় ভেবে যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যপাঠ, বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে দেশে দেশে। ভাবতে অবাক লাগে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপিকা জান ওপেন্‌শ-র বাংলার লোকসংস্কৃতির উপর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ 'সিকিং বাউল্‌স অফ বেঙ্গল' (প্রকাশনা—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস) 'ল্যান্ডমার্ক' হিসেব চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বের বইবাজারে এবং 'জার্নাল অফ অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ', বইটিকে 'Startling, illuminating, erudite and absolutely engrossing' বলে অভিহিত করেছে। আরও অবাক হই সর্বশেষ লন্ডন বুক ফেয়ারে প্রখ্যাত বাঙালি কথাসাহিত্যিক শংকর-এর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের ঝাঁ চকচকে ইংরেজি হার্ডবোর্ড সংস্করণের (ইংল্যান্ডের সুবিখ্যাত আটলান্টিক প্রকাশনা) অভাবনীয় সাফল্যে। পরপর তিনদিন ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ তিনটি খবরের কাগজ ফুল পেজ অভিনন্দন জানিয়েছে 'আধুনিক বাংলার আশ্চর্য হোটেলের কাহিনি'কে। 'দ্য গার্ডিয়ান' শিরোনাম করেছে—'বুক অফ দ্য উইক'; 'সানডে টাইমস্'-এ ভূয়সী প্রশংসা বেরিয়েছে প্যাট্রিক পার্কার-এর কলমে। এই অভূতপূর্ব সাফল্যে শংকর-এর নিজের প্রতিক্রিয়া এরকম :

" .... বহুবছর আগে হাওড়ার চৌধুরীবাগান লেনে হ্যারিকেনের আলোয় যে-সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছিল, ২০০৯ সালে লন্ডনে খ্যাতনামা সাহেবরা যে তাতে অটোগ্রাফ চাইবেন তা কে ভেবেছিল? অবজ্ঞা ও অপ্রাপ্তির যত ঘা এত বছর ধরে শরীর ও মনে বহন করেছি তা লন্ডনের মেলাপ্রাঙ্গণে মুছে গেল। অচেনা বিদেশিরা জানতে চাইছেন আমার চেনা বারওয়েল সায়েবের কথা, টেম্পল চেম্বার্সে বসে যাঁর মুখ থেকে লন্ডনের কথা প্রথম শুনেছি, তাঁকে অর্ধশতাব্দী পরে আমিই যে লন্ডনে পৌঁছে দিতে পারি, এই ভেবে চোখ সজল হয়ে উঠল।

আমার মনে হল, বাংলা কথাসাহিত্যকে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে। আমাদেরও যে দুনিয়াকে কিছু দেওয়ার মতন আছে, লন্ডন বুক ফেয়ার তার ইঙ্গিত দিল।

বাংলা ভাষার লেখকরা যদি তাঁদের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে বিশ্ববিজয়ে বেরুতে চান, তা হলে তাঁদের প্রথম বুক-স্টপ অবশ্যই লন্ডন বুক ফেয়ার। ..."

'চৌরঙ্গী'-র সাফল্যে উদ্‌বুদ্ধ পেঙ্গুইন প্রকাশ করেছে 'জন-অরণ্য'র ইংরেজি সংস্করণ 'দ্য মিড্‌লম্যান'। প্রদীপ সিংহের অনুবাদে ওরিয়েন্ট লংম্যান সম্প্রতি প্রকাশ করেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসিক কিশোর উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'-এর ইংরেজি সংস্করণ 'মুন মাউন্টেন'। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অশোক মিত্রের অসামান্য

আত্মজৈবনিক রচনা 'আপিলা-চাপিলা'-র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে সাম্য। শিপ্রা ভট্টাচার্যের অনুবাদে বইটির নাম —'এ প্র্যাটলার্স টেল : বেঙ্গল, মার্কসইজম, গভর্নেন্স।'

সুমিতা চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের দশখানি বিখ্যাত কবিতার একটি অভিনব সংকলন : 'জীবনানন্দ'। এখানে মূল বাংলার সঙ্গে প্রতিটি কবিতার ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও জার্মান ভাষ্য সংকলিত হয়েছে। অনুবাদকদের মধ্যে আলোকরঞ্জন ও ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত, লোথার ল্যুৎসে, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, তরুণ ঘটক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নাম। মার্টিন কেম্পশেনের অনুবাদে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচিত রচনা' প্রকাশ পেয়েছে জার্মান ভাষায়। এই ৬০০ পৃষ্ঠার মোটা বইতে আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, সঙ্গে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপচারিতার অনুবাদ। অনুবাদ ও এই বইটি প্রসঙ্গে কেম্পশেনের মহার্ঘ উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—

“....অনুবাদের কাজে আমি যখন একা একা রক্তাক্ত হই, তখন এক ধরনের প্রবল উল্লাসে আমার প্রায় মাথা ঝিমঝিম করে। ভাবি, সত্যিই আমি দেবদত্ত এক বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী—রবীন্দ্রনাথের সহস্রষ্টার মর্যাদা লাভ করেছি আমি। তিনি আর আমি যোগ দিয়েছি জার্মান কবিতা রচনার জাদুখেলায়। তিনি আর আমি মিলে রচনা করছি জার্মান 'গীতাঞ্জলি'। সুতরাং কবিতাগুলো শুধু যেন চমৎকার না হয়—সেগুলো হয়ে উঠুক —প্রায় — মূল বাংলার মতো বাঁধুনির দিক দিয়ে তেমনই মজবুত এবং ভাবের দিক দিয়ে তেমনই অকৃত্রিম। ...”

প্রকৃত অনুবাদ এভাবেই অনুবাদের সীমা ছাড়িয়ে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে উল্লসিত করে তোলে অনুবাদককে।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কী দুর্বার গতিতে আজ ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্বে তা আরও দুটি দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার করতে চাই। ইংল্যান্ড থেকে উইলিয়াম রাদিচে যা ভাবেন মস্কো থেকে ইরিনা প্রকোফিয়েভাও তাই। দু'জনেই মুগ্ধ বিস্ময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়গান করেছেন।

এক. “ ... যখন আমার বিশ-একুশ বছরের বয়সের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা শিশু সাহিত্য— বিশেষ করে 'সহজ পাঠ' বা 'টুনটুনির বই'—পড়ে, তাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটি পাঁচ-ছয় বছরের বয়সের বাঙালি ছেলে বা মেয়ের মতো নয়। যখন আমরা 'ডাকঘর' পড়ি, আমরা নাটকটির চরিত্র ও তাৎপর্য, প্রতীক নিয়ে আলোচনা করি—কিন্তু একটা ইংরেজি অনুবাদ পড়ে প্রায় একই আলোচনা সম্ভব হত। এই বইগুলির প্রধান আকর্ষণ— সেই মুহূর্তে, যখন এক বছরের বাংলা পড়াশোনার পরে আমার ছাত্রছাত্রীরা বাংলা সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করে—বইগুলির ভাষা। সেই প্রেমে পড়ার মুহূর্তে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ হঠাৎ সঙ্গীতের মতো হয়ে যায়, একটি শব্দ নৃত্যশিল্পীর আঙুলের একটি মুদ্রার মতো হয়, ব্যাকরণ নাচের তালের মতো হয়। আমার ছাত্রছাত্রীরা যে তা বোধ করে, সেটা আমি তাদের মুখ-চোখে দেখতে পাই। অনেক সময় একটা বাক্যের মানে

বুঝিয়ে দেওয়ার আগে তারা হাসে। তাদের হাসিতে প্রমাণ হয় যে তারা বাংলা ভাষাটাকে ভালোবাসতে শুরু করছে, তারা ভাষাটির প্রেমে পড়ছে।

তাদের অনুভূতি প্রায় 'ডাকঘর'-এর অমলের মতো, যখন সে দইওয়ালার ডাক শোনে :

দই—দই—ভালো দই।

অমল দই কিনতে চায় না—কিনতে পারে না, তার পয়সা নেই। দইওয়ালার ডাকের প্রধান আকর্ষণ দইয়ের মধ্যে নেই—সেটা ডাকটির সুরে। ..."

[উইলিয়াম রাদিচে]

দুই. " ... রুশ ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা পড়াতে আমি তাঁর 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'এক ডজন গপপো' প্রভৃতি ব্যবহার করি। সত্যজিৎকে পড়তে পড়তে আমার ছাত্রছাত্রী যারা ভবিষ্যৎ রুশ কূটনীতিবিদ—তারা বাংলা ভাষা শেখে আর একই সঙ্গে সত্যজিতের অদ্ভুত জগতে ঢোকে, বাঙালির জাতীয় চরিত্রের পরিচয় পায়। পটলবাবু সিনেমায় কী করে অভিনয় করল, বঙ্কুবাবুর গর্ববোধ কী করে প্রকাশিত হল অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে দেখা করার পরে, সোনার কেল্লার খোঁজের সময় ছোটো মুকুল ও তার সঙ্গীদের কী কী হয়েছিল এ সব জানতে পেরে বাংলা ভাষা, বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসায় না পড়ে উপায় নেই। ..."

[ইরিনা প্রকোফিয়েভা]

হ্যাঁ, ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের মেলবন্ধন ঘটছে ইংরেজ কিংবা রুশ জীবনের সঙ্গে। তাই দইওয়ালার ডাক শুধু দইকে বোঝাচ্ছে না, এই ডাকের কুহকী আবেদন বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিংবা চোদ্দো হাজার ভাষা জানা ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং-এর সঙ্গে দেখা হলে, কথা হলে মানুষ কতখানি পালটে যেতে পারে, গর্বিত হতে পারে তার কোনো ভাষাগত প্রকাশ হয় না; সেই ভাষাহীন অনাবিল সারল্য বাঙালি সভ্যতার প্রতীক হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ভিন্ন সংস্কৃতির দেশে।

॥ ৮ ॥

শুধু কি তাই, বাংলার পালেও আজ অপরাপর ভাষার সাহিত্য — জীবন ও সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি — পাড়ি দিচ্ছে অভাবনীয় দক্ষতায়। এই যে 'চিলেকোঠার উন্মাদিনী : ফরাসি সাহিত্য বিষয়ক ও অন্যান্য প্রবন্ধ' যেখানে এলিয়ট সম্পর্কে অভিনব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কবিপত্নী ভিভিয়েনের জীবনকাহিনি, আছে এলিয়টের যৌনকবিতা, লা রোশফুকো, জর্জ সাঁদ, রদ্যাঁ ও সত্যজিৎ, ফ্লবের, মালার্মে, আঁরি মিশো, রবীন্দ্রনাথ, রল্যাঁ, সার্ত্র, জাঁ আনুই, বেকেট প্রমুখ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্বের অলোকসামান্য উন্মোচন; কান্ডারি চিন্ময় গুহ, প্রকাশনায় আনন্দ পাবলিশার্স—এ বিষয়ে এত ভালো বই বাংলা

ভাষা খুব কম দেখেছে। প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক মারি দারিওসেক-এর অনন্যসাধারণ উপন্যাস 'নেসাঁস দে ফাঁ তোম'-এর বাংলা অনুবাদ 'আমার ভৌতিক স্বামী' সম্প্রতি প্রকাশ করেছে পারপ্‌ল পিকক বুকস। ভিন্ন স্বাদের এই উপন্যাসের অনুবাদক সঙ্ঘমিত্রা দালাল। লা রোশফুকোর 'মাক্সিম'-এর বঙ্গানুবাদের নতুন সংস্করণ বের করেছে দে'জ। আলব্যের কাম্যুর চিরস্মরণীয় উপন্যাস 'লেত্রাজে'-র ভাষান্তর করেছেন পবিত্র সেনগুপ্ত। 'অপরিচিত' নামে এই অনুবাদের প্রকাশক এবং মুশায়েরা। একই সঙ্গে তারা প্রকাশ করেছে মারগ্যারিৎ দ্যুরাস-এর উপন্যাস 'লামঁ'-এর বাংলা ভাষান্তর, অনুবাদক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। মূল ইটালিয়ান থেকে দান্তে আলিগিয়েরির 'ভিতা নুওভা' 'নবীন জীবন' নামে অনূদিত হয়েছে বাংলায়। পঁচিশটি সনেট, একটি চারণিক গান এবং পাঁচটি গীতি সহ মোট একত্রিশটি কবিতার অসামান্য অনুবাদ করেছেন শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশে ভাষাবন্ধন। অমর শিশুসাহিত্য 'অ্যালিস ইন দ্য ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর ভাষান্তর করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় 'আজব দেশে অমলা' নামে, প্রকাশে লালমাটি। বিশ্বশ্রেষ্ঠ অ্যাবসার্ড নাটক 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র বাংলা অনুবাদ 'গোডোর জন্য অপেক্ষা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ডাভ পাবলিশিং হাউসের হাত ধরে, অনুবাদক বিভাস চন্দ। লাতিন আমেরিকার গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর গল্পসমগ্র অমিতাভ রায়ের অনুবাদে প্রকাশ করেছে দে'জ। কিছু বছর আগে অমিতাভ রায়ের অনুবাদে গার্সিয়া মার্কেসের কয়েকটি গল্পের একটি সংকলন অনুষ্টুপ থেকে বেরিয়েছিল। এই 'গল্পসমগ্র'-এর গল্পগুলি অবশ্য সাজানো হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখান হালের গল্প থেকে উলটো কালানুক্রমে ফিরে যাওয়া হয়েছে তাঁর গোড়ার দিকের লেখায়। এই গ্রন্থে রয়েছে গার্সিয়া মার্কেসের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং 'পুনশ্চ অথবা কথা শেষ করার আগে দু-চার কথা।' উপরি পাওনা হিসেবে এ-বইতে যুক্ত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'জাদু বাস্তবতা ও মার্কেসের গল্প'। এবং মুশায়েরা প্রকাশ করেছে মূল স্পেনীয় ভাষা থেকে সেরভান্তেস-এর 'ডন কিহোতে'র প্রথম বাংলা সংস্করণ। স্পেনীয় সরকারের আর্থিক অনুদানে এবং তরুণ ঘটকের সোনার কলমে এ-বই অনুবাদের সীমা ছাড়িয়ে বাঙালি পাঠকের হাতে এক মহামূল্য সম্পদ হয়ে ফিরে এসেছে। সাহিত্য আকাদেমি প্রখ্যাত সমালোচক ভাষাবিদ গোপীচাঁদ নারঙ-এর উর্দু গ্রন্থ 'সাখতিয়ত, পাস্-সাখতিয়ত আউর মশ্‌রিকি শরিয়ত'-এর বাংলা অনুবাদ 'গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব' ছেপেছে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানি সাহিত্য আকাদেমি মূল লাতিন ভাষা থেকে 'ডিভাইন কমেডি' ও রাশিয়ান থেকে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর বাংলা ভাষান্তরের কাজ করছে জোর কদমে। খুব শীঘ্রই এই মহাগ্রন্থ দুটি প্রকাশের আলো দেখবে। আর একখানি কৃশতনু অথচ মহামূল্যবান গ্রন্থের কথা না-উল্লেখ করে পারছি না। চৈতন্যদেব একবর্ণ বাংলা লেখেননি; কিন্তু বাংলা কাব্যজগতে তাঁর অভিঘাত সমুদ্রের মতো। এই চৈতন্যকাব্যের বাংলা অনুবাদ (সঙ্গে সংস্কৃত মূল) পাঠকের হাতে পরিবেশন করলেন বীতশোক ভট্টাচার্য। প্রকাশনায় আর. এন. আর

এন্টারপ্রাইজ। আধুনিক বাঙালি পাঠকের কাছে বইটির অপরিসীম গুরুত্ব অনুবাদকের বিনয়াবনত আত্মম্ভরিতায় পরিষ্কার—

"... প্রায় পাঁচ শতক ধরে বাংলায় চৈতন্যচর্চার ধারা বয়ে চলেছে। বিমানবিহারী মজুমদার, রাধাগোবিন্দ নাথ, সুকুমার সেন, সুশীলকুমার দে, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, হরিদাস দাস ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্য-সাধক বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের নতুন নতুন দিক খুলে দিয়ে গিয়েছেন। মহাজনদের সে পথ ধরে এই কৃশতনু পুস্তকের আবির্ভাব : এই প্রথম চৈতন্যকাব্য স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকাসম্বলিত ও সটীক, সংস্কৃত মূল ও আধুনিক বাংলা কবিতায় অনুবাদসমেত পাঠকসমক্ষে পরিবেশিত হল। মূলে কচিৎ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, রূপান্তরণের সময় যে কোনও একটি পাঠকেই সমীচীন গুরুত্ব দিতে হয়েছে। মূলে বিবিধ ছন্দের প্রয়োগ ছিল, কবিতায় অনুবাদের ক্ষেত্রে নানা রূপবন্ধ নির্মাণের স্বাধীনতা ব্যবহৃত। অস্বাক্ষরিত সব অনুবাদও বীতশোক ভট্টাচার্য কৃত। পরিশিষ্ট অংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শিক্ষাষ্টকের বাংলা কাব্যে রূপায়িত রসভাষ্য সংযোজিত। ভক্ত বৈষ্ণব খোলকেও শ্রীখোল বলে থাকেন, গ্রন্থনামে এবং ব্যক্তিনামে শ্রীবর্জনের জন্য আমি ভক্তজনের ক্ষমাপ্রার্থী। রামকৃষ্ণের হস্তলিখিত পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, চৈতন্যর স্বাক্ষরিত নতুন কোনও পুথি পরে কেউ হয়তো আবিষ্কার করবেন। তার পূর্বে মূলত এই চৈতন্য রচনাবলি শ্রদ্ধালু পাঠকের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হবে আশা করা যায়। ..."

(ভূমিকা, 'শ্রীচৈতন্যের কবিতা', বীতশোক ভট্টাচার্য)

এই সমস্ত সাম্প্রতিকতম গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অন্য ভাষার সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্যকে শুধু বাঁচিয়েই রেখেছে বলব না, বরং অনেক নিপুণতর দক্ষতায় বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারকে আমাদের নাগালের মধ্যে আনবার চেষ্টা করে চলেছে অহর্নিশ। নাটকের ক্ষেত্রেও বাংলায় বহুদিন থেকেই সোফোক্লেস, শেক্সপিয়র, চেকভ্, গোর্কি, লোরকা, ব্রেখট্ প্রমুখের মঞ্চসাফল্যের ধারা বয়ে চলেছে গিরিশ ঘোষ, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তীদের হাত ধরে। আজকের প্রজন্মের মঞ্চায়ন কিন্তু কোনোভাবেই সেই ধারার থেকে পিছিয়ে নেই, বরং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা পারিবারিক জীবন জটিলতার নিখুঁত উপস্থাপনায় আঞ্চলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে সার্বজনীনতার অনায়াসসিদ্ধ প্রকাশে তা অধিকতর পারংগম হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না বোধ হয়। সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ সংস্কৃতির নাটক 'ইয়ে' এবং চুপকথা প্রযোজিত 'মিসেস সোরিয়ানো' দেখার সৌভাগ্য হেতু দু'কথা বলার স্পর্ধা জাগে। 'ইয়ে'-র মূল কাহিনি সুইস-জার্মান লেখক পিটার বিকসেল-এর, অনুবাদে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যরূপ কৌশিক রায়চৌধুরীর; 'মিসেস সোরিয়ানো'-র মূল কাহিনি ইতালির নাট্যকার ডি. ফিলিপ-এর, অনুবাদ অরুণ মুখোপাধ্যায়-এর, নবরূপ দিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

'ইয়ে'র মূল বিষয় মানুষে মানুষে সন্দেহ প্রবণতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা। নাটকে

সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা মানুষ হতে চেয়ে 'ইয়ে' হয়ে যায় এবং সেই 'ইয়ে' থেকে বেরিয়ে আসতে 'সে' হয়ে ওঠে। এই 'সে' চায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, মানুষকে সাহায্য করতে—কিন্তু যেহেতু সে 'ইয়ে' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে, তাই সে সকলের করুণার, ঘৃণার পাত্র। ছাঁচের বাইরে আমরা যেতে পারি না, আমরা 'ইয়ে' হয়েই থেকে যাই আজীবন। কী অসাধারণ এই বিষয়বস্তু। ভৌগোলিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে পৃথিবীর সব দেশের সব অঞ্চলের গড়পড়তা সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ (?) জীবনদর্শন প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টার একক অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন দেবশংকর হালদার, বাংলা নাট্যজগতে অভিনয়ের ইতিহাসে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে মনে করি।

'ফিলুমেনা মার্তুরানো'র বাংলা সংস্করণ 'মিসেস সোরিয়ানো'র বিষয় পাতিতা নারী ও তার সন্তানের সমাজ স্বীকৃতির দাবি। ফিলুমেনা এখানে ডোমেনিকোর সঙ্গে লড়াই করে তার তিনটি অবৈধ সন্তান ও নিজের সমাজ স্বীকৃতির দাবিতে। একটি সন্তান ডোমেনিকোর, কিন্তু বাকি দুটি সন্তানেরও স্বীকৃতি চায় তাদের পতিতা মা। শেষ পর্যন্ত তার যুদ্ধ জয় বাস্তবায়িত হয় উদারচেতা ডোমেনিকোর সঙ্গে বিয়ে ও তিন সন্তানের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। এইভাবে পুরুষতন্ত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ ডোমেনিকো ফিলুমেনার সংগ্রামী দৃঢ়তার বিজয়-পতাকা ধরে সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে। ফিলুমেনার চরিত্রে ডলি বসু, ডোমেনিকোর চরিত্রে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাইকেল, ডায়ানা ও আলফ্রেডোর চরিত্রে যথাক্রমে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লহরী চট্টোপাধ্যায় এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ অভিনয় বাংলা ভাষায় বিদেশি নাটক মঞ্চায়নের সাবলীলতাকে আরও একবার প্রতিষ্ঠা করে।

॥ ৯ ॥

মঞ্চসাফল্যই হোক বা অনুবাদ নৈপুণ্য, মাতৃভাষায় বিদেশি সাহিত্যচর্চায় ভিন্‌দেশের তুলনায় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। যেহেতু আমাদের সাহিত্যসাধ অফুরান, তাই সীমিত চেষ্টাতেই মাতৃভাষার মাধ্যমে ছুঁতে চাই ভিন্‌দেশি সাহিত্যের সম্ভার। এরকমই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বর্তমান গ্রন্থখানি। পাঠকের অনুসন্ধিৎসার শেষ নেই। আমাদের সেতুবন্ধনের অন্বেষণ যদি পাঠকের মননকে ঋদ্ধ করতে পারে, এই তৃপ্তিবোধটুকু অন্তত থাকবে যে আমরা ভুল পদক্ষেপ নিইনি। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান, ইতালীয় পর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি ও নেপালি — এই বারোটি ভাষা-সাহিত্যের সেতুবন্ধনের ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমরা ব্রতী হয়েছি। বহু চেষ্টা করেও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার সাহিত্যকে দুই মলাটের মধ্যে আনতে পারিনি।

লজ্জা করে যে কলকাতায় প্রখ্যাত চিনা লেখক লু সুনের আবক্ষ মূর্তি বসল, তাঁর লেখা অবলম্বন করে নাটক মঞ্চস্থ হল শহর কলকাতার বুকে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও

চিনা ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগাযোগ নিয়ে কোনো লেখা পাওয়া গেল না। বাঙালির সঙ্গে চিনের যোগাযোগের ইতিহাস আজকের নয়। সেই কবে বাঙালি পর্যটক অতীশ দীপঙ্কর চিনের লাসায় গিয়েছিলেন! তারপর কতকাল কেটে গেছে, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে চিনকে শতরূপে আবিষ্কার করেছেন শিক্ষিত ভারতবাসী। কিন্তু বাংলায় চিনা-চর্চা সেভাবে এগিয়েছে কি? মূল চিনা থেকে বাংলায় যে সমস্ত বই সরাসরি অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে 'তাও-তে-চিং' এবং 'ল্যুন-য়্যু' উল্লেখযোগ্য। এ-দুটি বইয়েরই অনুবাদক অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ ছাড়া প্রখ্যাত চিনা ভাষাবিদ নারায়ণ সেনের 'নয়া চিনের গল্প সংকলন' প্রথম খণ্ড, ৪৯-৫৯; 'নয়া চিনের গল্প সংকলন' দ্বিতীয় খণ্ড, ৬০-৬৯ এবং 'নয়া চিনের গল্প সংকলন' তৃতীয় খণ্ড, ৭০-৭৯ বাংলা ভাষায় চিনা সাহিত্য অনুবাদের উজ্জ্বলতম উদাহরণ। এই তিনটি খণ্ডেরই প্রকাশক বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয়। এই বইগুলি ছাড়া মূল চিন থেকে বাংলায় আর কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সরাসরি অনূদিত হয়েছে বলে এই লেখকের জানা নেই (অবশ্য ওই বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ আরও ভালো বলতে পারবেন), যদিও বিক্ষিপ্তভাবে অনেক ছোটো ছোটো কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন ১৯৬২-তে সীমান্ত সংঘর্ষের অনেক পরে যখন দু'দেশের সম্পর্কের বরফ কিছুটা গলে, ভারত থেকে একটি প্রতিনিধি দলকে চিনে পাঠানো হয়, যে দলে অন্যতম সদস্য ছিলেন সাহিত্যিক মৈত্রেয়ী দেবী। তিনি চিন থেকে পত্রাকারে যে সব খবর পাঠিয়েছিলন আনন্দবাজার পত্রিকা তা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেছিল তখন। এ ছাড়া আরও অনেকের চিন সম্পর্কিত অজস্র রচনা নিয়ে ১৯৮৩-র কলকাতা পুস্তক মেলায় আনন্দ পাবলিশার্স ছেপেছিল একটি মহামূল্যবান সংকলন — 'মাওয়ের পর—চিন থেকে প্রতিবেদন (১৯৭৬-১৯৮২)'। লেখক তালিকায় বরুণ সেনগুপ্ত, রণজিৎ রায়, অরুণ বাগচী, অভীক সরকার প্রমুখ স্মরণীয় নাম।

চিনা ভাষায় আবার বাংলা সাহিত্য চর্চা তুলনায় আরও কম। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা সে দেশে অনূদিত হয়েছে। বিশ্বকবির প্রতিমূর্তিও বসেছে বেজিং-এর মিউজিয়মে। কিন্তু রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্য চর্চা সেভাবে এগোয়নি চিনে। বর্তমানে অবশ্য বেশ কিছুটা উৎসাহ দেখা দিয়েছে। যেমন ব্যক্তিগত সূত্র থেকে জানি বয়োজ্যেষ্ঠ চিনা অধ্যাপক তুং জীবনানন্দ অনুবাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। খুব শীঘ্রই তা প্রকাশের আলো দেখবে। বুদ্ধদেব বসুকে নিয়েও কাজ হচ্ছে ওই খ্যাতিমান অধ্যাপকের কলমে। আমরা অপেক্ষায় রইলাম। আশা করব চিনা ভাষায় বাংলা সাহিত্যচর্চা ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হবে।

শুধু কি চিন, কোরীয় ভাষার পাঠ্যক্রম আছে এখানে, আছে আরবি ভাষার, কিন্তু কথা দিয়েও লেখা দিতে পারলেন না অনেকে। ফলে শূন্যতার সৃষ্টি হল। অনুশোচনা হয় কিন্তু হতাশ হই না। পরবর্তীকালে চিনা আরবি, ফারসি, কোরীয়, সংস্কৃত, তামিল, গুজরাতি, মারাঠি প্রভৃতি কিছু ভাষার সঙ্গে বাংলার সেতুবন্ধনের কাজ নিয়ে এগোবার

অঙ্গীকার করছি। এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শ্রদ্ধেয় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, চিন্ময় গুহ, তরুণ ঘটক। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য ও উদ্ধৃতি পেয়েছি আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, কৃত্তিবাস, কবিসম্মেলন, যাপনচিত্র ইত্যাদি ব্যবসায়িক ও সবুজপত্র থেকে। ওই সমস্ত পত্রপত্রিকার কাছে আমার ঋণ স্বীকার করি। আর অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার একনিষ্ঠ, কর্মোদ্যোগী, সাহিত্যপ্রেমী প্রকাশককে, যাঁর হার্দিক সহযোগিতা ছাড়া এ-কাজ কখনওই সম্ভব হত না।

পরিশেষে বলি, আমরা বদ্ধপরিকর সাহিত্য বিমুখতার কাছে কোনোভাবেই পরাজয় মানব না। মনে পড়ছে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের বিশ্ববন্দিত উপন্যাস 'Hundred Years of Solitude' (ইংরেজি অনুবাদ গ্রেগরি রাভাসা কৃত) বা 'নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ'-তে জ্ঞানী কাতালানের একটি মন্তব্য। কাতালান বলছেন যে বেশ্যাবাড়িতে হারিয়ে যাওয়াই হল সাহিত্যের ভবিতব্য। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি, সাহিত্যই একমাত্র আমাদের নিয়ে যেতে পারে 'বৃহত্তর আমি'-র সৌন্দর্যলোকে। সেই হিরণ্ময় আলোর উদ্ভাসে স্নাত হতে হলে আমাদের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। যথার্থই বলেছেন উইলিয়াম রাদিচে :

" ... যদি আমরা সকলে টাকা, ক্ষমতা, সাফল্যের পরিবর্তে শুধু ভাষাকে ভালোবাসতে শিখতে পারতাম, পৃথিবী হয়তো আরও শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হত। ..."

১ জানুয়ারি, ২০১০

রজতশুভ্র মজুমদার

সূচিপত্র

বাংলা অনুবাদে ইংরিজি
দেশি না বিদেশি ভাষা? : সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ২৯

বাংলা এবং স্প্যানিশ ভাষার
সেতু বন্ধনে সাহিত্য : তরুণ ঘটক ৪৮

বাংলায় ফ্রান্স, ফ্রান্সে বাংলা : সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ৫৬

গ্যোয়টে থেকে গুন্টার গ্রাস
রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ রায় : সুনীল দাশ ৭৭

বাংলায় রুশ সাহিত্য, রাশিয়ায় বাংলা : পূরবী রায় ৯০

ইতালীয় কবিতার বাংলা ভাষান্তর : জয়শ্রী চৌধুরী ৯৮

বাংলা ভাষায় পর্তুগিজ সাহিত্যচর্চা : অরুন্ধতী রায়চৌধুরী ১১৪

বাংলা ও জাপানি সাহিত্য ক্ষেত্রে
পারস্পরিক পরিচয় নেহাতই আংশিক : অভিজিৎ মুখার্জি ১২৪

নেপালি ভাষায় বাংলা সাহিত্য এবং
বাংলা ভাষায় নেপালি সাহিত্যচর্চা
একটি বিবরণধর্মী সমীক্ষা : আনন্দগোপাল ঘোষ ১৩৯

বাংলা ভাষায় সাঁওতালি ভাষা-
সাহিত্যের চর্চা : অনিমেষকান্তি পাল ১৪৫

শ্যামল ভূমি ও ছাউনির ভাষা : অরুণা মুখোপাধ্যায় ১৬১

বাংলা ভাষায় হিন্দি সাহিত্য চর্চা
হিন্দি ভাষায় বাংলা সাহিত্য চর্চা : সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪

বাংলা অনুবাদে ইংরিজি ঃ দেশি না বিদেশি ভাষা?

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" বুঝে বহু বিদেশি ভাষায় পারঙ্গম মধুসূদন বাংলার দিকে মুখ ফেরালেন। বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ, সম্ভাবনাময় লেখক রমেশচন্দ্র দত্তকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে। কিন্তু ইংরিজি কি সত্যি বিদেশি ভাষা না ভারতীয়ত্ব লাভ করেছে? ইংরিজি থেকে বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব আর বৈশিষ্ট্য অতএব অন্য রকম। আর কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। ইংরিজি ছাড়া আধুনিক বাংলা অকল্পনীয়। অন্য ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদ যতখানি হয়েছে, ইংরিজি থেকে তার চেয়ে যে বহুগুণ বেশি হয়েছে এটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়, বাংলায় আধুনিকতা এসেছে ইংরিজির পথ ধরে। বলতে গেলে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি ইংরিজিকে আত্মস্থ করেছে। কিছুটা প্রাণের টানে, অনেকটা রুটি রুজির তাগিদে। আধুনিক বাংলা ভাষার বিশেষত গদ্যের সঙ্গে ইংরিজি থেকে বঙ্গানুবাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন। এক সময় তো এমনও মনে করা হত, আধুনিক বাংলা রচনা মানেই ইংরিজি কোনো লেখার অনুবাদ বা অনুসরণ। এক মিশনারি পত্রিকায় জনৈকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> "Bengali Literature is even now in its infancy. In proof of this startling quation, we need only to refer to the plain fact that (with the exception of a number of disreputable erotic works) the great majority of Bengali books of any rate are foreign originals, Even Ishwar Chandra Vidyasagar is principally distinguished as a translator or imitator of foreign models".

এই অভিযোগ যে পুরোপুরি মিথ্যা নয়, তা বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু ওই বিশেষ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এটাই বরং স্বাভাবিক, তাও বলেছেন যেমন—বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে (বিদ্যাসাগর এক অগ্রগণ্য অনুবাদক ছিলেন) তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন মন্তব্য করেছেন—

"কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনা প্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল। ঐরূপকালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ গ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে। ইহা এক সাধারণ নিয়ম।"

লেখকের মনোভাব যদি সাধারণ বাঙালির চিন্তার প্রতিফলন হয়, অন্তত আংশিক ভাবেও, তাহলে ইংরিজির বঙ্গানুবাদের গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ধরেই নেওয়া হত, একটি জাতির সন্ধিক্ষণে বিদেশি ভাষার (এক্ষেত্রে শাসকদের ভাষার) সহায়তায় অগ্রসর হতে হবে। তবেই ঘটবে সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ।

তারপর প্রশ্ন ওঠে, অনুবাদ কি ভাবে হত, কে বা কারা করত। অনুবাদ সাধারণত, দুই ভাবে হয়। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক। কেউ হয়তো নিজের খুশিতে অথবা কোনো বিশেষ কারণে একটি বিদেশি ভাষার রচনা অনুবাদ করলেন। অথবা কিছু সংস্থা তৈরি হল যাদের কাজই অনুবাদ। প্রধান কাজ অথবা অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি। সাহিত্য সমালোচক মীনাক্ষী মুখার্জি এইভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন—

> "This was part of a natural process of cultural transmission within the country which did not need the mediation of academies or government patronage. In the early twentieth century Saratchandra Chatterjee became a household name in many linguistic regions of the country without any institution sponsoring the translation of his work......These translations happened spontaneously and created their own readership".

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় বেশ কয়েকটি প্রকাশনা ও রচনা সংস্থা গঠিত হয়েছিল—'খ্রিস্টিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি', 'স্কুল বুক সোসাইটি', 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি'। শেষোক্ত সংস্থাটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এইসব এবং অন্যান্য সংগঠনের একটি বড়ো কাজ ছিল ইংরিজি বই বাংলায় অনুবাদ করা। তার সঙ্গে ধর্মীয় উদ্দেশ্যেরও মিশেল ছিল না, এমন নয়। ১৮২১ সালে ফেলিক্স কেরি অনূদিত জন বানিয়ানের Pilgrim's progress প্রকাশিত হয়। নাম 'যাত্রীদের অগ্রসরণ'। অবশ্য 'তীর্থযাত্রী' কথাটাই সঠিক হত। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর এক অসাধারণ ধর্মভিত্তিক অ্যালেগরি মূলক রচনা। একটি সেরা ইংরিজি ভাষার ক্ল্যাসিকও বটে। অনুবাদক বইটির

ধর্মীয় তাৎপর্য না সাহিত্যমূল্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন, না উভয়কেই, বলা কঠিন। বানিয়ান সে যুগের এক বিপ্লবীও ছিলেন। ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধে ক্রমওয়েলের বাহিনির এক সৈনিক। তবে তা নিয়ে অনুবাদকের আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না।

বঙ্গানুবাদিত আর এক ইংরিজি বিশ্ব বিখ্যাত ক্ল্যাসিক 'রবিনসন ক্রুসো'। এবং এই অনুবাদ করা হয়েছিল এক সংগঠনের তরফ থেকে।

> "ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি-র প্রথম প্রকাশিত বই (আনুমানিক ১৯৫২-৫৩) 'রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত'। ভারতীয় ম্যান ফ্রাইডের কথা ভেবেই বোধ হয় উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন আর এক রবিনসন, রেভারেন্ড জন রবিনসন। 'রবিনসন ক্রুসো'র অনুবাদের প্রথম সংস্করণ অবশ্য নিছক অনুবাদ ছিল না। পাঠক পাছে সাংস্কৃতিক দূরত্বের ফলে মূলপাঠের ভাব ও অনুষঙ্গ ধরতে না-পারে, সেই জন্য স্থান-কাল-পাত্র বদলে কাহিনিটিকে যুক্ত করা হয় পরিচিত আবহের সঙ্গে, সাজিয়ে নেওয়া হয় দেশীয় প্রচ্ছদে, রবিনসন ক্রুসো পরিণত হয় কলকাতানিবাসী আর্মেনীয় বণিকে, জাহাজডুবির পর সে আশ্রয় পায় পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপে। রবিনসন-কৃত রবিনসনের ওই রূপান্তর যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও, চতুর্থ সংস্করণে ক্রুসো ফিরে পান তাঁর নাম-ধাম। অধিষ্ঠিত হন স্ব-মহিমায়"।

ম্যান ফ্রাইডে ছিল ক্রুসোর অনুগত অ-শ্বেতাঙ্গ দাস। অনুবাদক কি আশা করেছিলেন যে ভারতীয়রা অনুরূপভাবে ব্রিটিশ প্রভুদের সেবা করবে? যাই হোক 'রবিনসন ক্রুসো'র দুই ধরনের অনুবাদ, আক্ষরিক ভাষান্তর ও ভারতীয়করণ, তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা দেখব ইংরিজি থেকে বাংলায় অনুবাদ দুই ধারা অনুসরণ করেছে এবং ভারতীয়করণই লাভ করেছে অধিক জনপ্রিয়তা।

বিদ্যাসাগর ও ইংরিজির বঙ্গানুবাদ

বাংলার অনুবাদের ইতিবৃত্ত বিদ্যাসাগরের উল্লেখ ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। তিনি ছিলেন এক প্রথম শ্রেণির অনুবাদক। ইংরিজি ও সংস্কৃত থেকে যা অনুবাদ করেছেন তা প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের জন্য লক্ষণীয়। যদিও কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলত, কেবল অনুবাদের মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখে তিনি মৌলিক প্রতিভার বড়ো একটা পরিচয় দেন নি। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমরা কেবল তাঁর ইংরিজি-বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করব। বিদ্যাসাগরের ইংরিজি জ্ঞান সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিকের মন্তব্য ঃ

> "Vidyasagar learnt English late, from his English contacts and from friends who had studied in Hindu College, but mastered it, sufficiently to translate or adapt numerous texts, even Shakespeare's Comedy of Errors".

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ কর্ম নিয়ে, আমরা দেখব, কিছু সমালোচনা সে যুগে হয়েছিল। কিন্তু সে সবই রাজনৈতিক বা সামাজিক ধাঁচের। তাঁর ইংরিজি বিদ্যার গভীরতা বা রচনার প্রসাদগুণ নিয়ে বোধ হয় কেউ প্রশ্ন তোলে নি।

বিদ্যাসাগরের ইংরিজি থেকে বাংলা অনুবাদ বিষয় বৈচিত্র্যের ব্যাপারে বিস্ময়কর। রেভারেন্ড টমাস জেমসের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে তিনি ঈশপের 'ফেবল' বা নীতিশিক্ষামূলক কাহিনি গুচ্ছ বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এই সংকলনই "কথামালা" নামে সুপরিচিত। জেমস্ লং বইটির simple and elegant style এর প্রশংসা করেছিলেন। যদিও তিনি মনে করতেন উন্নতির অবকাশ আছে। বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 'বাংলার ইতিহাস' অনুবাদ করেছিলেন। পরে এই বই ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছিল। বাংলা থেকে ইংরিজি, তার আগে ইংরিজি থেকে বাংলা, ভাষান্তরের এই নাগরদোলা নিঃসন্দেহে কিছুটা বিচিত্র ও রেওয়াজ বিরুদ্ধ। হয়তো এ ঘটনা ইতিহাসটির জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে। তবে কিছু সমসাময়িক ব্যক্তি আপত্তি তুলেছিলেন। ভাষা সম্বন্ধে নয়, ইতিহাসের মর্মবস্তু নিয়ে। মার্শম্যান খুব নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। ইংরেজদের শত্রু, বিশেষত নবাব সিরাজকে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেছেন। যেমন "ব্ল্যাক হোল" এর কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত ঘটনা প্রসঙ্গে। বিদ্যাসাগরের এ হেন ইতিহাসের অ-পরিবর্তিত অনুবাদ সঠিক কাজ হয়েছিল কি না, এমন প্রশ্ন কেউ কেউ কেউ তুলেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের অন্য উল্লেখযোগ্য অনুবাদ কর্ম, বিখ্যাত লোকের জীবনী সংকলন, "জীবন চরিত" ও 'চরিতাবলী'। ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও এই রচনা লেখা হয়েছিল ইংরিজি বই অবলম্বন করে।

> "Jivancharit and Charitabali are material from William and Robert Chambers' 'Exemplory and Instructive Biography' (Edinburgh, 1846) to present brief life-histories of leading western scientists, along with those of Grotius, Valentine Duval (a Shephard boy who rose to become a historian) and Jenkins (son of an African prince who managed to get a British education). The concentration on scientists (Copernicus, Galileo, Newton, Linnaeus) indicates Vidyasagar's nationalist preferences, and so perhaps is the insertion here of Grotius".

অধিকাংশ জীবনীর বিষয় যাকে বলা হয় from rags to riches। লগক্যাবিন থেকে হোয়াইট হাউস যাত্রা। কিভাবে একটি মেধাবী, পরিশ্রমী বালক খুব সাধারণ ঘরে জন্মেও যশ ও অর্থ অর্জন করল। এ ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ ছিল অত্যধিক বিজাতীয়করণ।

বাংলার, ভারতের ছেলেরা (মেয়েদের কথা আসছে না) কি কেবল বিদেশি উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? সব উদাহরণ অনুকরণযোগ্যও নয়। যেমন, কিশোর দুভাল একটি বেড়াল মেরে তার চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করে সেই টাকায় বই কিনেছিল। কোনো ভারতীয় ছেলে, হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন, কি এমন কাজ করবে, না করা উচিত? এই বিতর্কের মধ্যে আমরা দেখি, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের বা নীতির পার্থক্য অনুবাদের উপরও ছায়া ফেলে। অনুবাদ বস্তুটি বিমূর্ত, স্থান কাল নিরপেক্ষ নয়।

আমরা দেখব, শেক্সপিয়র অনুবাদ বা ছায়াবলম্বন, ভারতীয়করণ বহু প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ঠিক পথিকৃৎ না হলেও রীতিমতো প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শেক্সপিয়রের The Comedy of Errors অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'। মজার কথা, শেক্সপিয়র নিজেও এই রচনায় এক প্রাচীন রোমান নাটকের রূপরেখা অনুসরণ করেছিলেন।

'ভ্রান্তিবিলাস' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিজে মন্তব্য করেছেন ঃ

> "কিছুদিন পূর্বে ইংল্যান্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়ার প্রণীত ভ্রান্তি প্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।.............বাঙ্গালা পুস্তকে ইউরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না, বিশেষত যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহার বাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নির্দেশিত হইয়াছে"।

এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যা করেছেন তা তাঁর অন্যান্য অনুবাদ কর্ম থেকে কিছু পৃথক। প্রথমত, ভারতীয়করণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ; ইতিহাস, জীবনী, বাস্তবভিত্তিক রচনার বেলায় নাম ধাম পাল্টানো অসম্ভব। নিউটন বা গ্রোটিয়াসকে কোনো ভাবে ভারতীয় বানানো যায় না। কাল্পনিক উপাখ্যানে তেমন দোষ নেই। ঈশপের নীতিকথা অবশ্য সর্বজনীন। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর নাটকটিতে মূল রূপ পরিবর্তন করে গদ্য কাহিনি রচনা করেছেন। তৃতীয়ত, একমাত্র এই অনুবাদেই বোধ হয় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য 'চিত্তরঞ্জন'। নীতিশিক্ষা বা জ্ঞান বিতরণ নয়। অবশ্য নীতিশিক্ষাও পরোক্ষে চিত্তরঞ্জন করে না তা নয়।

'ভ্রান্তিবিলাস' সমসাময়িক বিদ্বজ্জনদের প্রশংসা লাভ করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে সাধুবাদ দিয়েছিলেন একটি 'গদ্য কাব্য' উৎকৃষ্ট ভাবে রচনার জন্য। তবে দুঃখ প্রকাশ করলেন, শেক্সপিয়রের একটি 'নিকৃষ্ট' রচনা বেছে নেওয়ার জন্য। এ যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারীর ঘেঁটু পূজা। 'কমেডি অফ এররস্' শেক্সপিয়রের প্রথম দিকের লেখা। অবশ্যই মহাকবির শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্তর্গত নয়। তার পরেও বেশ মজাদার ও